সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের হাংরাস : আত্মজৈবনিক রাজনৈতিকতা

বেগম আকতার কামাল*

কোনো সৃজনশীল কবি যখন উপন্যাস রচনা করেন তখন আমরা সেই উপন্যাসের গদ্যস্বরে কবির সংবেদন ও অন্তর্লীন আত্মগহনতাকেই খুঁজি। আর আত্মজৈবনিক উপন্যাস হলে তো কথাই নেই, স্বয়ং কবির ভাবাদর্শ, টোন ও ভাষারূপের মুখোমুখি হই। এ-সূত্রেই জীবনানন্দ বলেন যে, উপন্যাস হচ্ছে Diversified Autobiography। কিন্তু উপন্যাস তো জাতির রূপকও – National allegory – ব্যক্তিমানুষের অবয়বে জাতিগোষ্ঠীর স্থানকালের জীবনকথার বয়ান। মার্কসীয় তত্ত্বাদর্শী কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের *হাংরাস* রচনাটিকে আমরা বলতে পারি আত্মজৈবনিক ও রাজনৈতিক পটকথার মধ্যে বহুজীবনলগ্ন ব্যক্তির মন ও মননের গদ্যশৈলী। এতে রাজনীতির বয়ানের সঙ্গে শ্রেণিমানুষ আর তাদের স্বপ্ন-সংগ্রাম-যাপনের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাও সমান্তরাল। আর জড়িয়ে আছে কবির জীবনাভিজ্ঞান ও সংবেদন।

উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় এপ্রিল ১৯৭৩ সালে। প্রাক্‌কথনে লেখকের বক্তব্য :

> একটা উপন্যাস লিখব। বিশ-বাইশ বছর ধ'রে একটা ইচ্ছা হয়েছিল মনের মাঝারে। কেমন করে লিখতে হয় না জানায় লেখবার সাহস সঞ্চয় করতে পারিনি। সত্তর সালের পর অবস্থাবৈগুণ্যে ধাক্কা দিয়ে আমাকে জলে ফেলে দিল। ভেসে থাকার জন্যে আমাকে হাত-পা ছুঁড়তেই হল। কিন্তু তাতে উপন্যাস হল কি না জানি না। [*হাংরাস*, দে'জ পাবলিশিং ২য় সংস্করণ, কলকাতা]

ইতোমধ্যে সুভাষ গদ্যরচনায় দক্ষ হয়ে উঠেছেন; ১৯৫০ থেকে ১৯৭৩ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে বিশটি গদ্যগ্রন্থ। এরমধ্যে রিপোর্টার্জ, ভ্রমণকাহিনি, জীবনী ইত্যাদিসহ অন্য স্বাদের মৌলিক গ্রন্থের সংখ্যা দশ। অনুবাদ করেছেন দশটি গ্রন্থ। সব মিলিয়ে তাঁর গদ্যচর্চা হয়ে উঠেছিল চৌকস ও শক্তিবন্ত। কাব্যিকতার নানা বীজকণা এই গদ্যের পরতে-পরতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল আকাশের নক্ষত্ররাজির মতো। *হারাংসের* লেখক মিত-সংহত বাক্যরাশি আর ছন্দস্পন্দের অন্তর্নিহিত গুণে ঋদ্ধ

---

*সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

করেছেন তাঁর গদ্যশৈলীকে। তাঁর কবিতার চালের মতোই যেন এই গদ্যভঙ্গিমা কথনের আশ্রয়ী। একেই সমালোচক সৌমিত্র লাহিড়ী 'প্রথমত' পত্রিকায় (ডিসেম্বর ১৯৮৮) অভিহিত করেন 'বীজ ছিল অন্তর্লীন',

> এই বীজ ছিল অন্তর্লীন। আর অন্তর্লীন বীজ কাব্যের মহৎ আবরণে ছিল গভীর আড়ালে। সেই কারণেই প্রথম পাঠের অপরিণত মানসে ধরা না পড়লেও এতদিন পরে, মনে হয় বীজ ছিল অন্তর্লীন এবং গভীর গোপন আড়ালে। কাব্য ছিল ছদ্ম আবরণ, স্বাভাবিকভাবেই স্পষ্ট পাঠের অভিজ্ঞতা এভাবেই বর্ণিত হওয়া উচিত যে ঔপন্যাসিক সত্তার চেয়ে হারাংসে কবিসত্তা ছিল অনেক বেশিভাবে ক্রিয়াশীল। দক্ষ কবিই পারেন আপাত সহজভঙ্গিমায় জীবনের গ্রন্থি মেলে ধরতে। ব্যবহার করতে অন্তঃসত্ত্বা শব্দমালা যার অন্তঃপুরে লুকানো থাকে আরেক ভবিষ্যৎ যা ক্রমশ শিশুর মতো বিকশিত হয় ধীরে ধীরে। হাংরাস সেই গর্ভবতী শব্দমালার এক বিস্ময়কর মুগ্ধতা এনে দেয়। (সুভাষ মুখোপাধ্যায় গদ্যসংগ্রহ ২]

একজন কবির রচনা বলেই এতে কবিতার বীজ অনুসন্ধান করেছেন সমালোচক। সকল উপন্যাসের ডিকশনে আর প্রতিরূপকে কোথাও না কোথাও কাব্যবীজ থাকেই, বীজের অঙ্কুরোদগমও লক্ষ করা যায়, যেমনটি আছে কমলকুমার মজুমদারের দুরূহ গদ্যশৈলীতে, আছে জীবনানন্দ দাশের অন্তর্দীপান্বিত উপন্যাসের ডিকশনে। সুভাষের গদ্যশৈলী ছোট-ছোট বাক্যে জুড়ে দেয় সরাসরি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ-মতাদর্শসমেত এক রাজনৈতিক-আত্মজৈবনিক নান্দনিকতা, লেখক যার আধার হয়ে আছেন, কেন্দ্র হয়ে আবর্তিত হচ্ছেন। আমরা এরকম নান্দনিকতা লক্ষ করি সতীনাথ ভাদুড়ীর *জাগরী* উপন্যাসে, গোপাল হালদারের ট্রিলজিতে এবং আরো রাজনৈতিক উপন্যাসের অন্তর্বয়নে। কী এই রাজনৈতিক নান্দনিকতা যা কবিতা-ছোঁয়া ও সংবেদনে অনুভববেদ্য! রাজনৈতিক উপন্যাসে থাকে বহুজনের সংলাপ-স্বর-অংশগ্রহণ, থাকে জনজীবনের শক্তি-সংগ্রাম-দ্বন্দ্ব, থাকে তাদের মতাদর্শ-স্বপ্ন আর ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষাবীজ। সুভাষ মুখোপাধ্যায় মার্কসীয় তত্ত্বাদর্শী, প্রত্যক্ষ আন্দোলন ও জেলজীবনের অভিজ্ঞতায় বিজ্ঞ এক সংগ্রামী কলমসৈনিক। ভারতীয় রাজনীতিতে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের কম্যুনিস্ট আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে-ওঠা তাঁর ব্যক্তিজীবন ও কবিসত্তা – দুই-ই জটিল দ্বন্দ্বাকীর্ণ, কখনো-বা প্রশ্নবিদ্ধ।

বিশ শতকের তিন ও চারের দশকের কম্যুনিস্ট ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠার কাহিনিই বিধৃত হয়েছে *হাংরাসে*। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের শেষ দশকের রাজনীতি ও শহুরে মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনযাত্রার চিত্র আঁকার প্রয়াস আছে। ভারতের স্বাধীনতা লাভের (১৯৪৭) অব্যবহিত পরের সময়ের জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতি এর প্রেক্ষাপট। লেখক এই প্রেক্ষাপট বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলেন তৎকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতাযুক্ত ব্যক্তিমানুষের জীবন ও মনোপ্রতিবেশ। কাজেই একদিকে

মূল চরিত্র অরবিন্দ নামের মধ্যবিত্ত যুবকের আত্মজৈবনিকতা এবং উত্তম পুরুষে কথিত বয়ানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাদশা নামের মুসলমান শ্রমিকের সমান্তরাল বয়ান; তার কণ্ঠস্বর-উচ্চারণ, সংসার-সংস্কৃতি। সে সাধারণ শ্রমিক থেকে কীভাবে কম্যুনিস্ট হয়ে ওঠে তার ইতিবৃত্ত *হাংরাস*কে করে তুলেছে দ্বিস্বরিক এবং বিস্তারধর্মী জীবনপরিসরের কথায়ন। কাহিনির পরিবেশে আছে জমকালো রাজনৈতিক ঘটনার সমাবেশ, কিন্তু অন্তর্লীনভাবে রচনাটি রাজনৈতিক কর্মীদের অনুভূতিশীল মন ও সংবেদনশীল মানুষের আখ্যান।

'আমার কথা' ও 'বাদশার কথা'-এই দুই শিরোনামে পর্যায়ক্রমে উত্তম পুরুষরূপে চরিত্র দুটি ব্যক্ত করেছে তাদের অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক বীক্ষণ। মধ্যবিত্ত কম্যুনিস্ট অরবিন্দ (স্বয়ং লেখক) আর শ্রমজীবী বাদশা – উভয়ের জীবনকে দেখা ও যাপনের দৃষ্টিকোণ – কখনো সমান্তরাল, কখনো-বা একে অন্যের মধ্যে প্রবিষ্ট, পরস্পর-প্রভাবিত ও পরিবর্তিত। এর ফলে এক ধরনের আবর্তনশীল অস্থিরতা আছে কাহিনিতে, কিন্তু নতুনত্বও আছে। তারা নিজ নিজ মতাদর্শে স্থবিরতা বা বন্দিতায় বদ্ধ হয়ে থাকেনি। ফলে রচনাশৈলীতে যে গতি তৈরি হয়েছে তা পাঠককে শুধু ধরেই রাখে না, তাদের পাঠের ধারায় সঞ্চার করে দেয় মতাদর্শের স্রোত। দুজনেই জেলে অন্তরীণ অবস্থায় পারস্পরিক সম্পর্কে জড়িত। কলকাতার একটি পুরানো জেলখানায় ৪৭ দিনব্যাপী অনশন ধর্মঘট সম্পর্কে দিনপঞ্জির ঢঙে লিখিত এই উপন্যাসটি। কারাপ্রাচীর আর বাইরের পৃথিবী – দুটোই সমান্তরালভাবে উপস্থাপিত। রচয়িতার এই বিন্যাসরীতি ও উপস্থাপনার কৌশল অভিনব নিঃসন্দেহে। কবিতার স্তবকবন্ধের মতোই *হাংরাসে*র এই রূপবন্ধ।

তৎকালীন রাজনৈতিক শ্রেণিসংগ্রামের বিশেষ করে ভারতে কম্যুনিস্টদের আন্দোলন-সংগ্রামের এক পর্যায়ে উপন্যাসের 'আমি' অর্থাৎ অরবিন্দ আর বাদশা অন্যান্য কর্মীসহ জেলে বন্দি হয়ে থাকে। তারা হাঙ্গার স্ট্রাইক করছে। সেকারণে উপন্যাসটির নাম লোকমুখে উচ্চারিত হাংরাস। লবণ-আইন ভঙ্গের সময় মেদিনীপুরের গ্রামবাসী কারাবরণকারীদের অনশন ধর্মঘটকে 'হাংরাস' বলত। এই নামের মধ্যে যেমন আছে গ্রামবাসীর জীবনগন্ধ মাটির ঘ্রাণ তেমনি আছে 'মানুষের শরীরের ঘাম আর ফসলের স্পর্শমাখা বিপ্লবের ইশারা।' সুভাষের *হাংরাসে* গ্রাম নেই, আছে শহর ও শহরতলির বিচিত্র জীবনছবি আন্দোলন-মিছিল-বন্দিতা-হাঙ্গার স্ট্রাইক আর কলকারখানার কালিঝুলিমাখা শ্রমজীবীরা, তাদের বেঁচে থাকার লড়াই আর সে লড়াইকে দমনের জন্যে সরকারি পুলিশ বাহিনীর তৎপরতা। এ সূত্রে আমরা বাংলায় কম্যুনিস্ট পার্টির কার্যক্রমের একটা রূপরেখা এঁকে নিতে পারি।

দুই

১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের পর সোভিয়েত রাশিয়ায় কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র গঠনের প্রেরণায় ভারতবর্ষে বামপন্থি সংগঠনের জন্ম হয়। ১৯২৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়

কমিউনিস্ট পার্টি। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে এদেশে উপনিবেশ-শাসনে পুঁজিবাদী কাঠামো গড়ে ওঠে এবং দেশীয় বুর্জোয়াশ্রেণির উত্থান ঘটে। একদিকে পাশ্চাত্যের আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতি-মতাদর্শ প্রভাবিত মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণির সৃজনশীল-মননশীল সাহিত্য-সংস্কৃতি-জ্ঞানচর্চার বিস্তার লাভ, পাশাপাশি ধর্ম সংস্কার সাধনের তৎপরতায় সামাজিক-প্রাতিষ্ঠানিক ক্রিয়াকাণ্ডও শক্ত অবস্থান তৈরি করেছিল। তবে, দুই ধারার মধ্যেই ছিল প্রথমে ইংরেজ আনুগত্য, পরে স্বকীয়তা খোঁজার সূত্রে দেখা গেল সামাজিক ও অর্থনৈতিক দাবির আন্দোলন। এটি বিশেষভাবে দেখা দেয় উনিশ শতকের শেষ দিকে। ১৮৮৫ সালে যে কংগ্রেস গঠিত হয় তা ছিল বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের প্রতিষ্ঠান। ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশের রাজধানী ছিল কলকাতা। এখানেই বিকশিত হতে থাকে বুর্জোয়া সংস্কৃতির ধারা এবং রাজনৈতিক-সামাজিক গতিময়তায় এরা হয় ঐতিহাসিকভাবেই নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি। এদের চলা ছিল দ্রুত বিকাশের মধ্যে সক্রিয়, সাহিত্য-সাংবাদিকতায় এরা ছিল খুবই সৃজনশীল। সৃষ্টিকলা ও মননচিন্তায় নতুন-নতুন ধারা ও আঙ্গিক এদের হাতেই তৈরি হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ এই ঐতিহাসিক বুর্জোয়া জাতীয় চেতনার শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ; যদিও কালক্রমে তিনি আন্তর্জাতিক ভাবনায় উপনীত হতে পেরেছিলেন। তাঁর স্বাদেশিকতা ও মানবিকতা শেষ পর্যন্ত বুর্জোয়ার ঘেরাটোপে আবদ্ধ থাকেনি। তা ব্যক্তিমানুষ ও সমাজের মুক্তি ও ঊর্ধ্বতনের প্রেরণায় হয়ে উঠেছিল উজ্জ্বল। এই যে বাঙালি জাতির বিকাশ ধারায় আপাত দৃষ্টিতে বুর্জোয়া ও পাতি বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক রূপটি প্রাধান্য পেয়েছিল তা থেকেই উদ্ভূত হয় মার্কসীয় রাজনৈতিক তত্ত্বাদর্শে বিশ্বাসী কম্যুনিস্ট শ্রেণি। ইতিহাস নিরীক্ষণ করলে দেখা যায় এই কম্যুনিস্ট শ্রেণির মনস্তত্ত্বে পাতি বুর্জোয়া অহংবোধের গোপন সঞ্চারণ কমবেশি লক্ষণীয় যা তাদের নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণে সহায়ক হয়েছিল। আবার অহংবোধসম্পন্ন দ্বিধাদ্বন্দ্বের ফলে পার্টির আন্দোলন ও বিবিধ দুর্বলতা, জটিলতায় ও সংকটে পড়েছিল। এরই ফলাফল হচ্ছে সংস্কারবাদী হয়ে-পড়া সুভাষের বিশ্লেষণীবুদ্ধির এই দিকটিকেই তিনি অরবিন্দ চরিত্রের চিন্তায়-সংলাপে প্রতীকায়িত করেছেন। অরবিন্দের চিন্তায় এটি উন্মোচিত হয় :

> কমরেড প্রসাদের জন্যে আমার দুঃখ হয়। কমরেড স্টালিন সেই কবে এ কথা বলে দিয়েছেন যে, এ-দেশের বুর্জোয়ারা বরাবরের মত সাম্রাজ্যবাদের দলে ভিড়ে গেছে। তা তো হবেই, ওরা যে দেশের সর্বহারাদের অনেক বেশি ডরায়।... প্রসাদকে নেতৃত্ব থেকে হটিয়ে দিয়ে আমরা ঠিকই করেছি, কেননা সংস্কারবাদের পাঁকে পার্টিকে তিনি ডুবিয়ে দিয়েছিলেন – কিন্তু অমন মানুষ হয় না। আবার এটিও লক্ষ করেছি, পার্টিতে ভালো মানুষেরাই কিন্তু সংস্কারবাদের দিকে বেশি ঝুঁকেছেন। বিপ্লব খুব শক্ত কাজ। তার জন্য মন শক্ত করা দরকার। ভালমানুষির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে বলেই সংস্কারবাদের জড় সহজে উপড়ে ফেলা যায় না।
>
> তার মানে, 'কেন' 'কিসের জন্যে' এসব প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর। নইলে জেলে বসে লড়াই করে এ পর্যন্ত যেসব দাবি আমরা করেছি, তাই নিয়ে আমরা তো দিব্যি

> বহাল তবিয়তে থাকতে পারতাম। সেটা হতো সংস্কারবাদ। কিছু সুখসুবিদে পেতে খুশি থাকার লড়াই। রুটি নয়, আমরা চাই ভেঙে নতুন করে গড়তে। [*হাংরাস*, ৯৭ : ১৯৭৩]

কালের ধারায়, আগেই জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম ও আন্দোলনের একটি অংশ পাতি বুর্জোয়া গণতন্ত্রকামী হয়ে ক্রমে চরমপন্থার দিকে ঝুঁকে পড়ে। তিনের দশকে বামপন্থি আন্দোলনও সন্ত্রাসবাদের পথে চলতে শুরু করে। এদের মধ্যে সবচেয়ে সক্রিয় ছিল চরমপন্থি 'জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী' দলগুলো। এঁরা তিন ও চারের দশকে আত্মাহুতিও দিয়েছিলেন। আর এই দুই দশকের মধ্যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দিক থেকে আদর্শ ও তাত্ত্বিক প্রশ্নে কম্যুনিস্ট দলগুলো দক্ষিণপন্থিদের বিরোধিতার সম্মুখীন হচ্ছিল। এরমধ্যে ছিল অতি বামপন্থাও। অরবিন্দের স্মৃতিচারণে 'ওয়াকার্স পার্টি' নামে ১৯৩৩ সালে গঠিত এমন একটি দলের উল্লেখ পাওয়া যায়। অতি বামপন্থি, সংস্কারবাদী-ইত্যাকার বিভাজনে কম্যুনিস্ট পার্টি জটিল সময় অতিক্রম করতে থাকে।

১৯৪৫ সালের দিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি-পর্যায়ে কম্যুনিস্ট পার্টি আরো কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। তবে পার্টির কর্মকাণ্ড তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বিস্তার লাভে সমর্থও হয়। একই সঙ্গে পার্টি বৌদ্ধিক-সাংস্কৃতিক চর্চার সূত্রে প্রকাশ করতে থাকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, এমনকি কম্যুনিস্টদের নিজস্ব প্রকাশনা সংস্থাও গড়ে ওঠে। সর্বভারতীয় পার্টি কংগ্রেসে ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক সংগঠনের মাধ্যমে পার্টি শ্রমজীবী ও কৃষকের বিপুল সমর্থন পায়। ১৯৪৭-এর পরে ভারত সরকার ট্রেড ইউনিয়ন থেকে কৃষক সমিতি তথা কম্যুনিস্ট পার্টিতে ভাঙন ধরিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে সমান্তরাল সংগঠন গড়ে তুলতে থাকে। ১৯৪৫-৪৭ সালের মধ্যে জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলো সংগঠিত হয়ে ওঠে, তাদের আন্দোলনও সফল হয়। *হাংরাসের* মূল কথক অরবিন্দ ভারতের এই রাজনৈতিক পরিবর্তন-ভাঙন সম্পর্কে তার নিজের ব্যাখ্যা তুলে ধরে :

> আমাদের যে বুর্জোয়া, তারা যেমন জোরদার তেমনি টেটিয়া। জমিদারদের দলে নিয়ে রাষ্ট্রযন্ত্রটা বাগিয়ে বসে আছে, আসলে তারা সাদা সাহেবদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে স্বাধীনতার ভেখ পরে হয়েছে কালো সাহেব। এই পচাগলা সরকারকে জোরসে একটা ঠেলা লাগাও।

তৎকালে বহু কম্যুনিস্ট ও সহযোগী বাম সংগঠনগুলো এরকম মনোভাবই পোষণ করত। সে অর্থে *হাংরাস* রাজনৈতিক উপন্যাস। রাষ্ট্র বনাম প্রগতিকামী বিপ্লবীদলের এই ইতিহাসে স্ব-স্ব অবস্থানকে, ভূমিকাকে ও তাদের কার্যকলাপে সৃষ্ট ঘটনার তাৎপর্যকে নিরিখ করতে চেয়েছে জেলবন্দি অরবিন্দ। সময়ের বহমানতায় কাদের কী ভূমিকা এবং ইতিহাসগত-রাজনীতিগত পজিশন ছিল তারই আখ্যান *হাংরাস*। আর রাজনৈতিক উপন্যাসের যে-দাবি সময়সন্ধিকালের বয়ান ও সিভিল সোসাইটির ভূমিকা– তার প্রতিনিধিত্ব করছে ট্রেড ইউনিয়নের নেতা হয়ে ওঠা জেলেবন্দি বাদশা

ও তার শ্রেণিগত জীবনেতিহাস। এবং এই শ্রেণি শ্রমজীবীর অন্তর্গত। ইতিহাসগত কম্যুনিস্ট পার্টির ভুলভ্রান্তিরও ব্যাখ্যা দেয় অরবিন্দ। ক্ষমতার হাত বদলে ভারতে যে-পরিবর্তনগুলো দেখা দেয় – কম্যুনিস্ট পার্টি, বিশেষ করে অতি বামপন্থিরা তার যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারেনি। নতুন রাজনৈতিক কাঠামোকে তারা দেখলেন সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের সঙ্গে জাতীয় বুর্জোয়াদের আঁতাত রূপে। অরবিন্দের দৃষ্টিবীক্ষায় নেহরু হয়ে ওঠেন সেই আঁতাতের হোতা। তাঁকে সর্বভারতীয় কম্যুনিস্টরা নেতা হিসেবে মেনে নিতে পারেনি।

সংগ্রামের আরেকদিকে লক্ষ করা যায় ১৯৪৭ সালেই দেশে সংঘটিত ধর্মঘটের ঘটনা। কম্যুনিস্টদের তৃণমূল পর্যন্ত প্রসারণের ফলস্বরূপ শ্রমিক-চাষি ও ভূমিহীন ভাগচাষিদের মধ্যে সামন্তবাদবিরোধী আন্দোলন দেখা দেয়। হায়দরাবাদে তীব্র হয় কৃষক আন্দোলন। ১৯৪৮ সালের তেলেঙ্গানা বিদ্রোহের ফলে ভূস্বামীরা হাজারখানেক গ্রামে তাদের অধিকৃত জমিগুলো পুনর্বণ্টনে বাধ্য হয়। এই সংবাদ কলকাতার জেলে এসে পৌছালে *হাংরাসের* চরিত্ররা তেলেঙ্গানা বিদ্রোহের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশের জন্যে অনশন ধর্মঘট শুরু করে – এই তথ্যই আমরা উপন্যাসে পাই। কেননা এই তেলেঙ্গানা বিদ্রোহ ছিল কম্যুনিস্ট পার্টির রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্যে প্রথম সশস্ত্র সংগ্রাম। কিন্তু ইতিহাসের পরিক্রমায় দেখা যায়, ১৯৪৮-এ কম্যুনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে বামপন্থিরা নেতৃত্ব লাভ করে, যার ফলে কম্যুনিস্টদের সংগ্রাম বামসংকীর্ণতাবাদের ঘেরাটোপে আটকে যায়। এতে পার্টি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জনগণের সঙ্গে পার্টির সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয় এবং অনেকে পার্টি ছেড়ে চলে যাওয়ায় অন্যান্য প্রগতিশীল দলগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই বাস্তবতা নিয়েও অরবিন্দকে আমরা ভাবতে দেখি। ঘটনা থেকে দূরে জেলে বন্দি থাকায় তার পক্ষে বাইরের পুরো সংগ্রাম-সংকট ইত্যাদি সামগ্রিক একটা স্পষ্টতা পাচ্ছিল; বিশ্লেষণের দৃষ্টিকোণ গড়ে দিচ্ছিল। জনগণ থেকে পার্টি বিচ্ছিন্ন হওয়ার দরুন শ্রমিক শ্রেণির সংগঠিত গতিধারাও ব্যাহত হতে থাকে। উপন্যাসে উল্লেখ আছে ১৯৪৯ সালের রেলকর্মীদের ডাকে সাধারণ ধর্মঘটের ব্যর্থতার কথাও।

হাংরাস বামপন্থি জোটের ত্রুটিবিচ্যুতি উন্মোচনকারী ন্যারেটিভ। রচয়িতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও মূল্যায়নে এটি একদিকে আত্মজৈবনিক, অন্যদিকে তাঁর পলিটিক্যাল অ্যান্ড হিস্ট্রিকাল পজিশনের দলিল। ইতিহাসের মহাসময়ের মধ্যে জীবনের যাপিত খণ্ড সময় গ্রথিত। এখানে জেলখানার মধ্যেও লড়াকু মানুষগুলোর প্রতিবাদ-আন্দোলন চলতে থাকে, চলে শাসকের গুলিবর্ষণও।

ইতিহাস-সময়ের পরিক্রমায় দক্ষিণপন্থি জোটের কম্যুনিস্ট বিরোধিতার ফলস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি বলে ঘোষিত হয়। কয়েক হাজার সক্রিয়

কম্যুনিস্টকে বিনা বিচারে আটক করা হয়। তাহলে *হাংরাস* উপন্যাসে দেখা যাচ্ছে পার্টির শুভশক্তি জয়ী হয়নি। চারের দশকের ভারতে কম্যুনিস্ট আন্দোলন গড়ে তোলার পথে বাধাবিপত্তি যেমন ছিল তেমনি ছিল তাত্ত্বিক-চিন্তার ক্ষেত্রে ক্যাডারদের ব্যর্থতা ও প্রশিক্ষণের অভাব। উপন্যাসে কম্যুনিস্টদের এই পরিণতি সম্পর্কে অরবিন্দের বয়ানও ব্যক্ত হয়েছে। এই পার্টির বাইরে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথেও ছিল বাধাবিপত্তি; অরবিন্দ তা-ও ব্যাখ্যা করেছে। আর সমাজকাঠামোর জটিলতা নিয়েও সে কথা বলেছে। সনাতন সামাজিক প্রতিষ্ঠান, তার ধর্ম-সংস্কৃতি, জাতিভেদ-প্রথা, আঞ্চলিক বৈচিত্র্য বনাম জাতীয় একক চৈতন্য নিয়ে অরবিন্দ বহুত্ববাদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে যা তার সচেতন ভাবনার পরিচায়ক। এটা অনেকটাই মিলে যায় আজকের বহুত্ববাদী সমাজচিন্তার সঙ্গে। তবে এই বহুত্ববাদের প্রাসঙ্গিকতা মাত্র শহরগুলোর ক্ষেত্রে যেখানে নানা ধর্ম ও সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠী বসবাস করছে। হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্ব-মিলনও অরবিন্দের প্রত্যক্ষণে সুস্পষ্ট, তার মনোলগে হিন্দুদের মতো মুসলমানও 'বাঙালি'। মুসলমানের ধর্মীয় পরিচয়, প্রথা-সংস্কার প্রয়োজনমাফিক বর্ণিত হয়েছে বাদশার আত্মকথায়। সুভাষের উন্মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিভূ হচ্ছে অরবিন্দ ও বাদশা চরিত্রদুটি। চিন্তার যাথার্থ্য ও অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছেন কম্যুনিস্ট নেতাদের আচরণ দেখে। অরবিন্দের উক্তিতে তা প্রকীকায়িত :

> যখন চূড়ান্তভাবে কমিউনিজমের দিকে ঝুঁকে পড়েছি তখনকার একটা ঘটনা মনে আছে। একদিন বাসে বসে আছি। হঠাৎ দেখি সামনের সিটে বসলেন একজন জাঁদরেল ছাত্রনেতা। আমি তাঁর অপরিচিত একজন ভক্ত; ছাত্রসভায় তাঁর বক্তৃতার গুণমুগ্ধ শ্রোতা। চোখে ইশারা করে আমি সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়লাম।... আমি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম, 'মার্কসবাদের সঙ্গে ধর্মটাকে কি কিছুতেই মেলানো যায় না?' ছাত্রনেতাটি আমাকে একজন ড্যামরাস্কেলফুল ভেবে আমার দিকে ফিরে এমনভাবে তাকালেন যে, আমার বুক শুকিয়ে গেল। পিছিয়ে সোজা হয়ে বসে, সবাইকে শুনিয়ে যেটা আমি চাইনি, তিনি আমার মুখে ঠাস করে চড় মারার মত করে বললেন, 'না'। আমার সে-সময়কার 'হিরো' মার্কসবাদী সেই ছাত্রনেতাটি পরে কংগ্রেসে যোগ দেন, আইএনটিইউসির নেতা হন, পণ্ডিচেরীর ভক্ত হন এবং মারা যান। [তদেব, ১৪৬]

ইতিহাসসত্য ও পরিবর্তিত ব্যক্তির জীবনের বাস্তবতার মিশেলে *হাংরাস* স্বীকারোক্তিমূলক ডিসকোর্সও বটে।

এই উপন্যাসের আরেকটি ডিসকোর্স হচ্ছে উদ্বাস্তু সমস্যা। পশ্চিমবঙ্গের আদি বাসিন্দা আর তৎকালীন পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তুদের মধ্যে একটা বিচ্ছিন্নতার দেয়াল দাঁড়িয়ে যায়। এরকম বিচ্ছিন্নতার শিকার হয় ভারতের হিন্দুস্থানিরাও – যারা কলকাতায় কারখানায় শ্রম দান করে সেখানেই বসবাস করতে শুরু করেছিল। নগর কলকাতার গোটা সমাজপটের এইসব বিচ্ছিন্নতার ধরনধারণ *হাংরাসে* উপস্থাপিত হয়েছে

অরবিন্দের ভাবনা ও জীবনায়নে আর বাদশার শ্রেণিগত অবস্থান, ধর্মীয় পরিচয়ের সংস্কৃতির মধ্যে। ফলে উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে সমবায়ী জীবনরূপের চলচ্ছবি। বাস্তবধর্মী এই আত্মকথনমূলক উপন্যাসের সমালোচনা মূল্যায়নে উঠে আসে গভীর রাজনৈতিক বার্তা :

> ছয়ের দশকের মাঝামাঝি ভারতবর্ষে কম্যুনিস্ট আন্দোলনে যে বিক্ষোভ দেখা দেয় সুভাষবাবু তার উৎস সন্ধানের চেষ্টা করেছেন।... ভারতীয় সমাজের সকল প্রগতিশীল শক্তিকে একত্রিত করার সমস্যা এবং এই ঐক্যকে বাদ দিয়ে যে দেশের সামাজিক অগ্রগতি অসম্ভব – এই উপলব্ধি অনেক কম্যুনিস্টকেই গভীরভাবে নাড়া দেয়। লেখক সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁদেরই একজন এবং তাঁর রচনায় ঐতিহাসিক বিচারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই প্রশ্নগুলি উত্তর তিনি দিতে চেয়েছেন। [গ.স. কতোভস্কি, গলেদভকা, ১৯৭৭]

তিন

উপন্যাস যতই রাজনৈতিক তত্ত্বভিত্তিক ও মতাদর্শিক হোক তার মূল আশ্রয় হচ্ছে মানবমানবীর সম্পর্কের অনুভূতিশীল জীবনতত্ত্ব। রাজনীতির যুক্তি-তর্ক-পটপ্রেক্ষার সঙ্গে জুড়ে গেছে অরবিন্দের মধ্যবিত্ত জীবনবোধ ও শ্রেণিরাজনীতির বৈপ্লবিক ধারায় অন্বয়-অনন্বয়-দুটোই। নিম্নবিত্তের ট্রেড ইউনিয়নকর্মীতে রূপান্তরিত বাদশার 'অনস্থির' জীবনযাপন, পরিবারচিত্র ও আত্মময়তা যেমন আছে তেমনি আছে কেমন করে নিচু তলা থেকে রাজনৈতিক কর্মী গড়ে ওঠে আর তাদের জীবন কীভাবে তাদের তৈরি করে দেয় সংগ্রামী মানুষে। মধ্যবিত্ত অরবিন্দের জেলজীবন বা রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে খানিকটা বিরোধ আছে মধ্যবিত্ত শ্রেণিসুলভ সুখসুবিধা ভোগের স্পৃহা, কিন্তু বাদশার চরিত্র নির্দ্বন্দ্ব, তার শ্রেণিচেতনা আর জীবনযাপনায় কোনো বিরোধ নেই। সে-ই এই উপন্যাসের রাজনৈতিকতার ধারক-বাহক ও প্রতিভূও বটে। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত অরবিন্দরা রাজনীতি সচেতন ও সংগ্রাম-আন্দোলনে থাকলেও দ্বিধা-দুর্বলতায় কেন্দ্রচরিত্র হতে পারে না। তবে উপন্যাসে এ সত্যও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, মধ্যবিত্তই রাজনীতির চেতনা সঞ্চার করে দেয় নিচু তলার খেটে খাওয়া মানুষদের মধ্যে। মধ্যবিত্তের সংসর্গে তারা বাদশার মতো পরিবর্তিত হয়ে শ্রমিকদের নেতা হয়ে ওঠার শক্তি ও মনোভাব তৈরি করে দিতে পারে। সমালোচকের বক্তব্য :

> হাংরাস উপন্যাসের সার্থকতা এখানেই। এই সরল সত্য সুভাষ মুখোপাধ্যায় অভ্রান্ত পরিচ্ছন্নভাবে প্রকাশ করেছেন। সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যে মানুষ গড়ে ওঠেন, অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম দিয়ে যাঁর শুরু তাঁর মনে দ্বন্দ্ব থাকবে না একথা ঠিক নয়। কিন্তু তার মধ্যে দ্বিধা যে অবসিত, সে প্রমাণ এই উপন্যাসের চরিত্রগুলি। যা কিছু দ্বিধা তা কিন্তু এই মধ্যবিত্ত জীবনেই, এবং তা তার অস্তিত্ব রক্ষারই তাগিদে। [দিলীপকুমার, ১৩৮০]

অর্থাৎ নিম্নবিত্ত-শ্রমজীবীর সংগ্রাম তার অস্তিত্ব ও অবস্থানকে পালটানোর তাগিদে আর মধ্যবিত্তের সংগ্রাম শেষে এসে নিজ শ্রেণি-অস্তিত্ব রক্ষায় অন্তরীণ হয়ে যায়। বহুমুখী

প্রশ্ন আর সংকটাকুল পরিস্থিতির পর্যবেক্ষণে অরবিন্দ যেন এক নিরীক্ষক। সে দ্রষ্টা, একই সঙ্গে অনুঘটকও, বাদশাকে সে চেতনাগত দিক থেকে পরিবর্তন করে। নিজে অবৈকল্যে তাঁর আদর্শে স্থির থাকে কি? এ প্রশ্ন স্বয়ং সুভাষ মুখোপাধ্যায়কেই করা যায়। ১৯৭৩-এ লেখা এই উপন্যাসে তিনি তাঁর অতীত অবস্থান ও আত্মসংকটকেই পর্যবেক্ষণ করেছেন। জেলখানায় বন্দি অবস্থায় অরবিন্দ যেমন আত্মবিশ্লেষণ করে তেমনি জীবনের গতি-প্রকৃতিকেও সহবন্দিদের মধ্যে নিরীক্ষণ করে। অনশনের সময় জেলডাক্তার জোর করে অনশন ভঙ্গের যে চেষ্টা করে সেসময় অরবিন্দের জৈবিক অস্তিত্ব উন্মোচিত হয়। অনশনের এক পর্যায়ে অরবিন্দ বাঁচার জন্যেই ডাক্তারের অপেক্ষা করে যে তাকে গলায় নল ঢুকিয়ে তরল খাদ্য উদরে প্রবেশ করাবে। তার অকপট আত্মোন্মোচন :

> মন জিনিসটা অনেক 'না' কে 'হ্যাঁ' করতে পারে, অনেক 'হ্যাঁ' কে 'না' করতে পারে। তাছাড়া অর্থনৈতিক যে-টান, নানা দিক থেকে তারও নানা রকমের কাটান আছে। গোটা শ্রেণির ভেতর দিয়ে না হলেও দলছুট ব্যক্তির ভেতর দিয়ে তা ফুটে উঠতে পারে।... এখন আমি অন্য কথা ভাবছি। সকলের জীবন এক ছাঁচে ঢালা হবে, তার কোনো মানে নেই। লড়াই সবাইকে করতে হবে তার কোনো মানে নেই। লড়াই ছাড়াও আমার জীবনের অন্য কোনো সার্থকতা থাকতে পারে। কেন আমি বিশ্বসংসারকে তা থেকে বঞ্চিত করব? কমরেডদের কাছে নিজের মুখ রক্ষার জন্যে? লোকের কাছে বীর কিংবা শহীদ নাম কেনবার জন্যে? [তদেব, পৃ. ১৫৮]

'উপন্যাস নয়, রিপোর্টার্জ' রচনার তাগিদ অনুভব করে অরবিন্দ বলে গেছে 'আমার কথাগুলো। যা বানিয়ে তোলা নয়। বাস্তব থেকে কুড়িয়ে তোলা।' যেদিন অনশন ভঙ্গ হলো সেদিন কাকতালীয়ভাবে ছিল অরবিন্দের জন্মদিন। যে জন্মদিনে পায়েসের বদলে জেলের হরলিকস খেয়েছিল অরবিন্দ। তার জীবনে দাদু আছেন আলোকবর্তিকার মতো। তাকে নিয়ে জেলে বসে অরবিন্দ অনেক কথাই ভাবে, মনে মনে তার সঙ্গে কথাও বলে। তার উপলব্ধি, জীবনভাবনায় শুধু বহির্জগৎ নেই– আছে মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির কথাও। কারণ তার ধারণা 'মানুষের জানবার ক্ষমতা সীমাহীন।... মানুষের জ্ঞানগম্যতার একটা বড় নির্ভর ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভূতি। সেই সহানুভূতির আঁচে ধরে অদৃশ্য কালিতে লেখা অনেক গুপ্ত চিঠির মর্মোদ্ধার করা সম্ভব।' তাই ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করার জন্য অনশন ভাঙে জেলবন্দিরা এবং গুলিবর্ষণে নিহতদের স্মরণে শহিদসভা হতে থাকে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের *হাংরাস* এক অনবদ্য আশ্চর্য সৃষ্টি, এতে এত চলমানতা, এত খাঁজ-ভাঁজ আর মোচড় আছে যে পাঠক নানা দিশায় ঘুরপাক খাবেন, কিন্তু খেই হারাবেন না। দুজনের আত্মকথার মধ্য দিয়ে বহু মানুষের বয়ান আর তাদের শ্রেণিমানসিকতা যেমন উন্মোচিত হয়েছে তেমনি অরবিন্দ-বাদশার স্ব-স্ব অন্তঃকথাটিও

রজ্জু দিয়ে সবাইকে গেঁথে নিয়ে জীবনমুখী মানুষের মালা তৈরি করেছে। বিবরণ, সংলাপ, গল্প, স্বপ্ন, বাসনা – সব মিলিয়ে এ–এক 'কথাপ্রবাহ'–আবর্তময়। সৌমিত্র লাহিড়ীর সমালোচনায় দেখি যে *হাংরাস* পরোক্ষ-প্রত্যক্ষ বচনে সমান্তরাল অথচ সংলগ্ন দুটি চরিত্র একে-অপরে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে বিচ্ছিন্নতায়, সাযুজ্যে। আমরা দেখি এতে সাদামাটা ভাষার ছন্দগতি কীভাবে কবি সুভাষকে গদ্যরূপে ধারণ করে আছে। মাত্র কুড়ি-একুশ দিনে লেখা এই উপন্যাসটি কবিতার মতোই স্বতঃউদ্ভূত জীবনায়ন, রাজনীতি আর আত্মময়তার সৃষ্টি। তাঁর *যত দূরেই যাই* (১৯৬২) কবিতাগ্রন্থের 'এই পথ' কবিতার উল্লেখ করা হয়েছে সমালোচক-কৃত *হাংরাসে*র আলোচনায়। কবিতাংশটি হচ্ছে :

...আমি আজও ভুলিনি
সামনে পেছনে সশস্ত্র পাহারা আকাশ পত্রজালে ঢাকা
আমরা বন্দীর দল পাথরে পা টিপে টিপে উঠছি
হঠাৎ আমরা কথা বন্ধ করলাম
তারপর কান পেতে শুনতে লাগলাম
স্তব্ধ পাহাড়ে ছলাৎ ছলাৎ ছল
এক অদৃশ্য ঝর্নার শব্দ...

সুভাষের *হাংরাসে*ও সেই অদৃশ্য ঝর্নার শব্দ ফল্গুধারা হয়ে বইছে। এই ঝর্না হচ্ছে জীবন – বেঁচে থাকার, লড়াইয়ের জীবন।

গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জি

গ. স. কাতোভস্কি, *গলোদভকা* (*হাংরাস*-এর রাশিয়ান অনুবাদ), সংকলিত সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গদ্যসংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, তদেব

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, 'জীবন অবাধ জীবন অগাধ', জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি সংখ্যা *পরিচয়* ১৯৭৪। সংকলিত, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, *গদ্যসংগ্রহ*, দ্বিতীয় খণ্ড, তদেব

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় 'হাংরাস', *পরিচয়*, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪

দিবেন্দু পালিত, 'অন্তরীণ বা হানসেনের অসুখ', *দেশ*, ৭ জানুয়ারি, ১৯৮৪

দিলীপকুমার গুপ্ত; 'হাংরাস' (প্রবন্ধ), 'চতুরঙ্গ', বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৮০

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, *উপন্যাস রাজনৈতিক*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ১৯৮৯

সুভাষ মুখোপাধ্যায়, *গদ্যসংগ্রহ*, দ্বিতীয় খণ্ড, দে-জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ২০১৩

স্বপন পাণ্ডা, 'সুভাষ মুখোপাধ্যায় : জীবন ও সাহিত্য' (প্রবন্ধ), *পত্রপুট* ৩৩, শারদীয় ১৪০২

সৌমিত্র লাহিড়ী, 'বীজ ছিল অন্তর্লীন', *প্রথমত*, ডিসেম্বর ১৯৮৩, সংকলিত সুভাষ মুখোপাধ্যায়, *গদ্যসংগ্রহ*, দ্বিতীয় খণ্ড, তদেব